# ছায়া - নৃত্য

অনুপম দত্ত



বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। অনেকদূরে দিগন্তের মত বনের কোলে আঁধার ছায়া জমছে। আর দিনের শেষ উজ্জ্বল রোদটি কঁাপছে গাছগুলির মগডালের পাতায় তখন যে যুবকটি মস্ত একটা গর পাল নিয়ে গাঁয়ে ঢুকছে তাররঙ কালো। তার টলমল চোখ দু'টি বেশ বড়। মুখখানির বাকি সব আদিবাসী চেহারার মিশেল। টাটকা সতেজ সুপুষ এই যুবকটিকে বেশ প্রশান্ত মনের মানুষ বলে মনে হয়। অবশ্য নামটি তার প্রশান্ত। প্রশান্ত বাদ্যকর। তার ড্রাইভিং লাইসেন্সে জাতের পরিচয়ে লেখা আছ মুচি। একদিন তার বাবা এই গাঁয়ের গো-রাখাল ছিল। বেশ গাঁট্টা - গোঁট্টা চেহারা। মা ছিল ছিপছিপে পাতলা। সুন্দরী। সাজলে জাতের গুমোর অনেক সুন্দরী মেয়ের চোখ আর ঠোঁটের হাঁবড়করে দিত। সই মা পাঁচবছরের তাকে আর সাতবছরের বোনটাকে ছেড়ে বাবুদের এক জোয়ান ছোকরার মোটরসাইকেলে চেপে কোথায় চলে গেল। বাবা জানতে পেরে গলায় দড়ি দিয়ে দিল।

এইসব কথা সে ঘনশ্যাম দাস বাউলকে শুনিয়ে দিল হড়হড় করে।

একটি মেটে ঘর, একফালি চালা, এক কোণে মাটির উনোন। উনোনের পাশে মাটির পাতল পোড়া কড়াই, একটি স্টিলের চকচকে থালা দুটি বাটি আর কেটলিটি। জলের পাত্র। এই সঙ্গে সে একা মানুষ - কতদিন। বোনটা ভাল ছিল পরের বছর গাঁ-যোল আনা মিলে তার বিয়ে দিল এক বিহারী যুবকের সঙ্গে। তার একটা খাটাল আছে দুর্গাপুরে। সেখানে শঙ্করী সুখে আছে। দু'টি বাচচা তার। তার হিন্দির সঙ্গে বাংলা মেশায়, বাংলার সঙ্গে হিন্দি। প্রশান্ত চোখে মুখে পরিতৃপ্ত হাসল। বাউল কোলের উপর দোতারাটির তারে খুব হাল্কা সুরে কোনও গান কি একটা গৎ বাজিয়ে যাচ্ছে। চালাঘরটির সামনে ফুটে আছে নীল সমুদ্রের মত আকাশ। নিচে চষা-অচষা মাটির সবুজ, কিছু গাছ-গাছালি। অনেকদূর হলেও স্পষ্ট ফুটে আছে এক ফালি তালবন। সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ঘনশ্যাম বাউল প্রশান্তর দিকে তাকাল। সে হাসি থামিয়ে বলল, 'একবার বিন্দাবন চলে গিয়েছিলাম।'

'জয় গু।'

'তো সেখানে একমাস ছিলাম।'

রাম - দুই - তিন - চার। রাম - দুই - তিন - চার... জোর শব্দে দ্রুত লয়ে একতারাটি বাজিয়ে 'রাম' সুরের ঝোঁকে তারের গায়ে বাঁকিয়ে তুলে আবার ধীর লয়ে তিন আঙুলে ধরা মোষের শিং থেকে তৈরী বাদন কাঠিটি চালাতে লাগল।

'তো বিন্দাবন ভাল লাগল না।'

'কেন?'

'গু, সেখানে কোনও বিন্দাবন নাই। সেখানে রাধাকিষ্ণ নাই।'

'বাহ্।'

'কিন্তু গাঁয়ে ফিরতে লাগল ছ-মাস।'

'বিন্দাবন থেকে আসতে।'

'না। সেখানে আলাপ হল এক পাঞ্জাবীর সঙ্গে। আমারই বয়েসী। বাংলা অল্পসল্প বোঝে। কিন্তু বলতে পারে না। সে আম

াকে নিয়ে গেল চিত্তরঞ্জনে।'
'চিত্তরঞ্জন!' বাউল মাথার এক বোঝা চুল দুলিয়ে হাসল, সেখানে আমি গান গেয়ে এসেছি। ওখানের শ্রোতারা দশ টাকা নোটের পাঁচশ চাকার একটা মালা গেঁথে আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল।
বাউল বিড়ির প্যাকেট বের করে প্রশান্তকে একটি দিয়ে নিজে ধরাল। তারপর দু-জনে খানিকক্ষণ ধোঁয়া টানাটানি করল। পাশে রাখা দোতারার তারে একটা বড় নাল মাছি ঝপ্ করে বসে পড়তেই ঠিং করে সুর বেজে উঠল। মাছিটা উড়ে গেল। প্রশান্ত জানাল কিষন সিং তার বন্ধুটির নাম। সে তার গান শুনে পাগল। বলে কি না সে এই গানের দাম দেবে। হাসল ঝকঝকে দাঁতে প্রশান্ত, তো, সে আমাকে একটা মোটর গ্যারেজে ঢুকিয়ে, দুমাসে ড্রাইভিং-এ পাকা করে দিলে। বাকি আর চারটা মাস আমি দিনরাত ট্রাক - ট্যাক্সি-ম্যাটাডোর চালিয়েছি। বুঝলেন কি না গু সমস্ত দিনরাত! ওই গাড়িতেই খেয়েছি। গাড়িতেই ঘুমিয়েছি। এক নম্বর মাল লোড্ করে দু-নম্বর গুদামে রেখেছি। আবার দু-নম্বর গুদাম থেকে বের করে এক নম্বরওলাদের ঘরে পৌঁছে দিয়েছি। হিহি হিহি....
বাউল নিরীক্ষার চোখে তাকিয়ে আছে তার নতুন শিষ্যটির দিকে।
বেশ কিছুদিন আগে একটি গানের আসর থেকে নামবার সময় পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল এই যুবক। রং জ্বলা সিনথেটিক কাপড়ের পাঞ্জাবীর সঙ্গে হাঁটুর কাছে কুঁচকে যাওয়া ক্ষয়াটে নীল প্যান্ট, ক্ষয়া হাওয়াই চটির ফিতেতে ফাট্ ধরেছে !
'আরে আরে 'তাকে দুহাতে তুলেছিল ঘনশ্যাম বাউল।'
'আপনার গান আমাকে পাগল করে দিল।'
'বাহ্। বেশ তো।'
'কোথা আপনার আশ্রম?'
'ঠিকানা বিনিময়ের পর প্রায় দেখাদেখি হচ্ছিল। একদিন বলল, আমাকে দোতারা শেখাবেন ?'
'শেখাবো । এসো!'
'না। আমাদের গাঁয়ে যেতে হবে। আমরা ক'জন মিলে শিখব। আপনার কত লাগবে?' তখনো ঘনশ্যামের জানা ছিল না প্রশান্তর জীবন-কথা। বলেছিল, 'আমি ছাত্র পিছু একশ টাকা নিই। মাসে চার দিন।'
দেবো। আরো কটা ছাত্র হবে।
ঠিক আছে। আস্য যাবার ভাড়া লাগলে।
সে আমি দেবো। আন্তরিক হাসল প্রশান্ত, সে আর কত। সাত সাত চোদ্দ টাকা। তারপর কথা দেওয়া দিনে যেতে পারল না ঘনশ্যাম বাউল। দশদিন পর যখন প্রশান্তর ঠিকানার গাঁটিতে পৌছল তখন দুপুর ফুরিয়ে গেছে।
প্রশান্ত তখন নদীটির ধারে গোঠের রাখাল। গগুলি আপনমনে চলছে। আর একটি গাছের তলায় বসে প্রশান্ত গলা ছেড়ে গান ধরেছে, ভাল করে সাজায়ে দে মা আমরা গোচারণে যাই---
তখন এক কিশোর ছুটতে ছুটতে এসে বলল, অ পেশান্ত দা, দেখ গা এক বাউল এসে তোমাকে খুঁজছে।
বাউল! কোথাকার বাউল?
কি জানি! কাঁধে দু-তারা।
আচ্ছা। ঠিক আছে। বল্ গা আমি যেছি।
আরও কিছুক্ষণ আলোর জোয়ার ছিল। কিছুক্ষণ গগুলি চারটি খেতে পারত। কিন্তু প্রশান্ত তাদের অবেলায় জড়ো করে পাচন-লাঠির প্যাঁচ দেখিয়ে খেদাল। তারা ছুটল কাদা পথ, ভাঙা পথ পেরিয়ে গাঁ মুখি। গাঁয়ের পথটি লালধুলোয় গে ধূলি রঙের ভরে গেল। তার ভেতর প্রশান্ত গগুলিকে নিজের নিজের ঘরমুখো পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরে দেখলো ঘনশ্যাম ব াউল একচালার দাওয়াটির উপর বসে বিড়ি টানছে।
এভাবে দেখা হবার পর যে জীবনকথা আরম্ভ হয়েছে, তো সেই জীবন, তোমাকে কি বলব গু, নেশা। টাকা পেছি। মাল খেছি। বাজে ফূর্তি করছি। আর থু থু ফেললে বুক থেকে গলা থেকে তেল- মবিল পোড়া কফ বেচেছ। সেই চারমাসে গু, তে ামাকে কি বলব জীবন আমার কয়লা হয়ে গেছে। বাঁশির সুর ভুলেছি। গু আমাকে বাঁচাও।

জয় গু। প্রশান্তর আত্মসমর্পণে ঘনশ্যাম বাউল মোহিত হল। বুঝল আধার আছে। এখন দরকার বাউল মনটির সঙ্গে পরিচয়। বাউল দোতারাটির সুরে বাজিয়ে দিল, খ্যাপা মনটি আমার... বলল, ভালই করেছিস ওই জীবন থেকে চলে এসে।

চলে আসা নয় গু, পালিয়ে এসেছি। সে তুমি বুঝবে না গু, ওখানকার মানুষের কত প্যাঁচ্, জানতে পারলে এমন জড়িয়ে দিল যে তুমি আর সুতোর ওড় খুঁজে পেতে না!

কিন্তু পেশান্ত, এখন তো অবস্থা যা দেখছি, ঘরে কেউ নাই, গ চরাস... তো, চলে কি করে?

বোঝা গেল না হিসেবটা। হাত নামিয়ে বলল, গ পিছু দশ টাকা। পালে আমার দু-শোটা গ।

একলা মানুষের মাস গেলে নগদ দু-হাজার টাকা আয়। এর জন্যে পরিশ্রম? যাকে বলে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া! ঘনশ্যাম প্রীত হল। তারপর চা তৈরী আর খাওয়া শেষ প্রশান্ত হলে অন্যদের ডাকতে। ওরা গান শিখবে। প্রশান্তর দোতারা অ াকৃতি সে একটা যন্ত্র জোগাড় করে ফেলেছে। কাছাকাছি গাঁয়ের বৈষ্ণবটি দেহরক্ষা করলেন। বিধবা বৈষ্ণবী প্রকট অভাবে পড়ে বাবাজীর দোতারাখানি বিক্রি করতে চায়। ওটিকে ঘরে আনার সময় ওর মেয়ে বলেছিল, বাবার যন্ত্র তুমি নিয়ে য াচ্ছ। মান রেখো।

যুবতীটির দুই ঢাল কাঁধ থেকে বুকের চূড়ায় উঠে নাভির উপত্যকা বেয়ে দুই জানুর উপর থেমেছে!

দেখি!

তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল প্রশান্ত। তারপর চোখ নামিয়ে দেখেছিল হাতে ধরা দোতারাটিকে একটি তার ছেঁড়া বা কিগুলি জং ধরা। বসে গেছে চামড়ার ছাউনি। গুকে না দেখিয়ে কেনা যাবে না ভেবে আড়াইশ টাকা দামে রফা করে পঞ্চ াশ টাকা আগাম দিয়ে ঘরে এনে ঝুলিয়ে রেখেছে। ঘনশ্যামের কাছে সেটা নামিয়ে সে যাদের খবরদিতে গেল তাদের একজন গেছে কুটুম ঘর, আর একজনের ঘরে ল-সম্বন্ধএসেছে। অন্যজন ঘরে নেই। পাড়ার দোকান থেকে চাল-ডাল-অ ালু আর হাঁসের দুটো ডিম কিনে ফিরে এল প্রশান্ত।

ঘনশ্যাম বাউল তখন নিজের দোতারাটির তারে সন্ধ্যাবেলার গুবন্দনার গানের সুর বাজাচ্ছে। প্রশান্ত নীরবে জিনিসপত্র রেখে লম্ফজ্বালাল। গো -চরণ থেকে আনা শুকনো কাঠকুটির গাদা থেকে জ্বালানি নিয়ে মাটির উনুন ধরাল। চা করল। আর একটু আঁচ ঠেলে দিয়ে মাটির পাতিলটায় ভাত বসাল। তার ভেতর থাকল আলু আর ডিমদুটি। কাজ করছে তার হ াত দুটি। কিন্তু মন ডুবে আছে। বাজনায়! বাজনা থামল একটু পর। প্রশান্ত স্টিলের গেলাসে লাল চা, আর কাগজের প্য াকেটে আনা মুড়ি আর ছোলাভাজা বয়ে আনল গুর কাছে। দুজনে এসব খেতে আরম্ভ করলে প্রশান্ত বলল, কাউকে প াওয়া গেল না গু, আজ আমি একা আপনার শিষ্য। উঠে গিয়ে ঘরের কুলুঙ্গি থেকে গাঁজার পুরিয়া আর নতুন কল্কে এনে গু-দক্ষিণার প্রথম উপচার হিসেবে নামিয়ে রাখল তার সামনে। হাসল ঘনশ্যাম। খুব তরিবৎ করে গাঁজার মশলা বানান হল। টান দেবার আগে ঘনশ্যাম কল্কের মাথায় আগুনের বিঁড়ি, যা নাকি সুত্লি ছেঁড়া পাকিয়ে বানানো, তাতে জ্বলন্ত ত ামাকের ভোগখানি শূন্যে তুলে হাঁকল, বোম্ ভোলা, আলবেলা---তারপর চোখ খুলে প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে মন্ত্রপাঠের সুরে বলল, গু করে সেবা, মস্ত্ রহে চেলা। তারপর কল্কেঠোঁটের কাছে নামিয়ে চরম টানে শুষে নিল। দশ আঙুল বাঁধা কল্কে ঠোঁট থেকে নামবার মুহূর্তে যেন আধিজাগতিককোনও বাতাস ছিঁড়ে নেবার মত শব্দ উঠল। কল্কেখানি এগিয়ে ধরল প্রশান্তর দিকে। ডান হাতের কনুইয়ের তলায় বাঁ-হাতের পাতা রেখে খুব শ্রদ্ধা আর বিনয়ের ভঙ্গিতে প্রসাদ গ্রহণ করল প্রশান্ত। কল্কে বার কয়েক হাত ফেরৎ হয়ে সব তামাক পুড়ে গেল। ধোঁয়ার নেশা ক্রমে দুজনের মাথার ভেতর জমতে শু করল। সন্ধে ফুরিয়ে যাওয়া রাতের আকাশ আর সবুজ অসবুজ মাটির পার্থিব একটা অংশ কোন অপ্রকৃতিক দৃশ্যে ফুটে থ াকল। সেখান থেকে ঝিঁঝিঁ আর তক্ষকদের কিংবা আরও কোনও অচেনা প্রাণীদের অদ্ভুত বাদনধ্বনি আরম্ভ হয়েছে !

প্রশান্ত কথা বলল, আমি ভেবেছিলাম গু, তুমি আর এলে না!

হাসল ঘনশ্যাম। লম্ফের আলো ছায়ার সেই হাসিটার ভাব গভীর হয়ে ফুটল।

কিন্তু এমন অসময়ে এলে যে কাউকে পাওয়া গেল না। খ্যাপা, গুকে অসময়েই আসতে হয়। আর গোপন তত্ত্ব একা ছাড়া জানা হয় না। আজ তুই একা আমার শিষ্য হবি। আমি তোকে দীক্ষা দেব খ্যাপা।

জয়গু!

বাউল-বৈষ্ণব সমাজের হৃদয়ের কথাটি মুখ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ, যা এতদিন কখনও কারও কাছে করেনি বা করতে হয়নি, সে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে গুর পায়ের উপর সে নিজেকে ফেলে দিল। আবার ঘনশ্যাম দু-হাতে তাকে তুলে বুকে জড়ালো। সামনে বসিয়ে বলল, বাবা পেশান্ত আয়, আগে তোকে বৈষ্ণব মন্ত্র দিই। ঘনশ্যাম দাসবাউল দোতারা বাজাতে শু করে গাইল, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে---, থেমে বলল, গা আমার সাথে। আবার গাইতে শু করতেই প্রশান্ত সুরেলা গলায় আরম্ভ করল। গান চালিয়ে যেতে ঘনশ্যাম তার ঝোলা থেকেবের করল এক থোকা ঘুঙুর আর একজোড়া খঞ্জনি। প্রশান্ত হাত বাড়িয়ে নিল খঞ্জনি দুটি। ঘনশ্যাম নিজের ডানপায়ের বুড়ো আঙুলে জড়িয়ে নিল ঘুঙুর গোছার দড়ি। কৃষ্ণ ভজনার গানের সঙ্গে মিশে খঞ্জনি, ঘুঙুর আর দোতারার সুর, একটি কুটিরের চালা থেকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এত যেন জ্যোৎস্না আর্য্যও প্রখর হয়ে একটা পাখিকে বিভ্রান্তকরে আকাশের এদিক থেকে ওদিকে একটানা ডেকে যেতে মগ্ন করল। কিন্তু সেটা সামান্য সময়।

হরে কৃষ্ণ গানের সাধনার মধ্যে গু হঠাৎ বলতে আরম্ভ করলেন, রাম দুই তিন চার, রাম দুই তিন চার... দোতারা বেজে চলল।

থেমে গেল প্রশান্তর গলার স্বর আর খঞ্জনি নাচানো হাতের শব্দ!

গু ওই রাম দুই.... সংখ্যা পর্যায় একই সুরে দোতারার তারে তারে বার কয়েক বাজিয়ে বললেন, এই হচ্ছে মন্ত্র। বাবা পেশান্ত, দোতারা শিখবার মন্ত্রটি আমি তোকে দিলাম। বাজা!

যে আমাকে তার অতীত জীবনের গল্প শোনাচ্ছিল, সে হচ্ছে একজন ট্রাক ড্রাইভার। আমদের পাড়ার একটি খড়ো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। তার বউ যেন একটা ফাটা কাঁসা! সবসময় চেঁচায়। তিনটি বাচচা সব সময় নিজেদেরমধ্যে মারামারি করে আর কাঁদে। ট্রাকের চাকরি, তাই ঘরে সে প্রায় দিন থাকে না। কিন্তু যে কটা দিন থাকে থালাবাটি বালতি মগ ছোঁড়াছুঁড়ি চলে। সঙ্গে চলে বউয়ের চিৎকার! আর তিনটে বাচচার সবসময় হুটোপুটি, মারামারি, সব শেষে সমবেত কান্নার শব্দ পাড়ার অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ! বোঝা যায় একটি অসুখী পরিবার এখানে বাস করে।

কিন্তু দু-এক সময় অনেক রাতে খালি গলায় গাওয়া কিছু বাউল-গান খুব পরিষ্কার আর সুরেলা শব্দে শোনা যায়।

একদিন তাকে সামনে পেয়ে শুধিয়েছি, আচছা, মাঝে মাঝে যে গান শুনতে পাই, সেটা কি আপনি করেন?

প্রশান্ত মৃদু হেসে বলছে, ওই আর কি। যখন একা হতে পারি, তখন সব মনে পড়ে।

সেদিন শুধোই নি, সব মনে পড়ে বলতে কি আপনি বোঝাচেছন? তবে কিভাবে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেছে। আজ আমরা একটা চায়ের দোকানের ভেতর বসেছি। দোকানের মালিক নেই। উনুন নেভানো। মালপত্তর একটা ঘরে তালাবন্ধ। বসবার মাটির ধারি শূন্য পড়ে আছে। সেই বিকেল থেকে অঝোর ধারে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। সামনের পথটিতে বইছে কাদাজলের স্রোত। অন্য দোকানগুলির ঝাঁপ প্রায় বন্ধ হয়ে পথটি একেবারে নির্জন। একইভাবে বিকেল ফুরিয়ে যেতেই একটু দূরে পথের মোড়ে জ্বলে উঠল স্ট্রিট লাইটের হ্যালোজেন বাল্ব। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোর ভেতর বৃষ্টি ঝরার পরিবেশ কোন এক রহস্যমাত্রায় চলে গেল। আমরা দোকানের ধারিতে পাশাপাশি বসে বিড়ি টানছি। প্রশান্ত মাঝে মাঝে কথা বলছে। চুপ করে থাকা সময়গুলোতে তীব্র হয়ে উঠছে দোকানের পেছনদিকে জলকাদার নর্দমায় ব্যাঙেদের কোরাস। মাঝে মাঝে জানেন, ওই জীবনে ছুটে যেতে খুব ইচেছ করে। মনে হয়, আবার গ চরাই, বাঁশি বাজাই। কৃষ্ণ সাজি।

কৃষ্ণ সাজি! মানে?

এক সাঁওতালের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম একটা ময়ূরপাখা। বিড়ি টানল বার কয়েক । চুপ করে থাকল আরও কিছুক্ষণ।

বাবার ছিল কেষ্টযাত্রার দল।

ও-ও।

একটা ঝুলিতে ছিল পাউডার সিঁদুর কাজল। আর ছিল ছোট আয়না, ছোটবড় কটা তুলি। ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল।

বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে ব্যাঙেদের গান!

তো একটা সময়, সেই ঝুলিটা নিয়ে, হ্যাঁ, একটা বাশিঁও পেয়েছিলাম। মনে হয়, বাবার কেষ্টযাত্রা দলের।

আবার বিড়ি ধরাল। আগুন শিখার আলো ছিট্‌কে পড়ল প্রশান্তর মুখের উপর একটু সময়।

এক পাল গ হাঁকিয়ে চলে আসতাম নদীর ধারের গো-চারণ মাঠে। বসে যেতাম জলের ধারে একটি শিরীষ গাছ তলায়। অতীত ছবির মত ফুটে উঠল। মাঝে মাঝে বিড়ি টেনে চলা ছায়ামূর্তি এক কথকের দিকে তাকিয়ে থাকলেও আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল এক সদ্য যুবক। কাঠের ফ্রেমে আটকানো ছোট আয়নাখানির ঝাপ্‌সা কাচে মুখের ছবি ফেলে রঙ মেখে কৃষ্ণ সেজে নিল। নদীর ধারের এক গোছা ঘাসলতা ছিঁড়ে ময়ুরপাখাটি বেঁধে মুকুট পরে নিল। কানে জড়িয়ে নিল লতাঘাসের কুণ্ডল। তারপর কাজল আঁকা বড়বড় চোখের দৃষ্টি নদী জলে ফেলে ঠোঁটেরউপর আড়াবাঁশটি তুলে বাজাতে শ করল। সেই সুরে বুঝি নদীর জল নীল হয়ে গেল। ওপারের দিগন্ত রেখার ঘনসবুজ ঢেউটি হয়ে গেল বৃন্দাবনের তমাল কুঞ্জ।

আর বললে বিশ্বাস করবেন না, কোথা থেকে সাতটা টিয়ে পাখি নদীর ওধারের গাছটির ডালে ডালে বসে প্রতিদিন আমার বাঁশি শুনতো। এটা আমার সামনে কিছুতেই দৃশ্য হল না। শুনে চললাম, আমার ছোট বেলাতেই বাবা মরে গেল। কেষ্টযাত্রা দলের কথা আমার তেমন মনে পড়ে না। ওই দলের কোনও গান আমার জানা নেই। তবু জানেন, কি জানি, কি করে সেইসব গানের সুর আমার বাঁশিতে বেজে যেতো।

এখান বাঁশি বাজাও ?

না। বুকের ভেতর সে হাওয়া নাই। একটু থামল। তারপর যেন আনমনে বলল,

তেল-কালি আর মবিলপোড়া ধুঁয়োর বাতাসে বাঁশি আর বাজবে না। তো, আপনাকে যেটা বলছি, আমাকে টেনে নিল বাউলগান আর দোতারার বাজনা। আমার দিকে সে ঝুঁকে এল, আপনি শুনে দেখবেন, পূববাংলার যন্ত্র দোতারা বীরভূমের বাউলের হাতে অন্য একটা আলাদা সুরে বাজে।

মন দিয়ে ঠিক শুনিনি।

শুনলে বুঝবেন, এই বাজনা কিভাবে আপনার বুকের ভেতর পর্যন্ত মুচড়ে দিচ্ছে। আর তার সুর আপনার মাথার ভেতর ঢুকতে যত ময়লা জঞ্জাল আর পচাকাদা সাফ করে দিচ্ছে।

একদিন শোনাবে তোমার বাজনা ?

ব্যাঙেদের সুর বাহারের মধ্যে এই চালাটির কোন্, ফাটলে ঢুকে থাকা এক ঝিঁঝিঁর ডানা বাদনের শব্দ মিশে বৃষ্টির অর্কেষ্ট্রা বেজে চলল! একটু চুপ থেকে প্রশান্ত ধীর স্বরে বলল, আমার দোতারার গল্পটা আমি আপনাকে শোনাতে চাইছি দত্তবাবু।

ও-ও। আচ্ছা আচ্ছা, বল।

তো গু আমাকে যে মন্ত্র শেখালেন, তাতে চিটিয়ে লেগে থাকলাম। সেই বিধবা বৈষ্ণবীর কাছ থেকে আনা যন্ত্রখানি গু সারিয়ে, নতুন তার লাগিয়ে এনে দিয়েছেন। আমি বাকি টাকাটা, জানেন, যেদিন সব টাকা মিটিয়ে দিতে গেলাম সেদিন মা আর মেয়ে এতো কেঁদেছিল যে তাদের আঁচল ভিজে গিয়েছিল। চোখ মুছছে আবার দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। তবে আমি ওদের বলেছিলাম, এ যন্ত্রের মান আমি রাখবো। বিড়ি দিন।

এরপর লাইটারের চকিত আলোয় একে অন্যের মুখ দেখাদেখি হল। চুপ থেকে খানিকক্ষণ বুকের ভেতর ধোঁয়া রেখে ভিজে বাতাসে বিলিয়ে দেওয়া হল। আর মনে হল, যতক্ষণ এই পরাণ কথা শেষ না হবে ততখন বৃষ্টির পর্দা থাকবে। থাকবে বাইরে আলো-অন্ধারের অনৈসর্গিক মায়া আর এই একচালাটির ভেতর আমাদের দুই ছায়া।

কৃষ্ণ সাজা টাজা বাদ। বাঁশি রেখে দিয়েছি চালের বাতার পাঁকে। এখন গর পালকে মাঠে ছেড়ে গাছতলায় বসে কেবল দোতারা সাধি। এই করতে করতে গুর কৃপায় কিছু গান তুলে ফেললাম। গুন্দনা আর আত্মাতত্ত্বের কটা গানও বাজাচ্ছি। গু খুব খুশী। একদিন বললেন, আমি আর্শীবাদ করছি, তুই একদিন বড় শিল্পী হবি। কিন্তুকি হল ? যাক্ সে কথা, আপনি জানতে চাইলেন, তাই সব বেরিয়ে আসছে। এরপর গু আমাকে দেহতত্ত্বের কিছু গান দিতে চাইলেন। কিন্তু বললেন, / এসব হচ্ছে গৃহ্যতত্ত্ব। শুধু গান গাইলেই হবে না। বেটা। এ গানের মর্ম বুঝতেহলে করে দেখাতে হবে। বুঝতে হবে চারিচন্দ্র ভেদ কি, দ্বিদল পদ্ম কাকে বলে! দেহতত্ত্বের জন্যে তাই নারী চাই বেটা সাধন সঙ্গিনী। না হলে কিছু বোঝা যাবে না। এসব হচ্ছে গিয়ে বোবার কথা বলা, কালার শুনতে পাওয়া। আর কানার রঙ্গ দেখা। বুঝতে পারছেন দত্তবাবু ?

না। একদম না।

পারবেন না বুঝতে। আমিও পারি নাই।

অনেক দূরে একধরনের ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ বেজে চলেছে। শহরের এদিকে একজোড়া লাইনের উপর সন্ধ্যারাতে ট্রেনখানি আসছে।

এবার শুনুন আমার জীবনের ঘটনা। একদিন বুঝলেন, হঠাৎ দেখলাম সামনে একটা যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে।কখন এল, কোথা থেকে এল একেবারে বুঝতে পারিনি। বাজনা থামিয়ে ফেললাম। কিন্তু কি হল জানেন, মেয়েটি ঝপ্‌ করে আমার সামনে বসে পড়ল। গণ্ডলি মাঠে। দুপুরের নদীজলে রোদকুচি নেমে চলেছে। শিরীষ গাছটির ছায়ামাখা বাতাস মেয়েটির গা থেকে সুগন্ধ তুলে বুঝি এক মোহে জড়িয়ে ধরল প্রশান্তকে।

মেয়েটি বলল, থামলে কেন? বাজাও শুনি।

প্রশান্ত খানিকটা বিমূঢ়। মেয়েটি একদৃষ্টে তার চোখের ভেতর তাকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু চেনা যাচ্ছে না কোনওভাবে এ কে, কোথায় দেখেছে !

আচ্ছা, তুমি আর বাঁশি বাজাও না?

নীবরে মাথা নাড়ল প্রশান্ত।

তোমার বাঁশি আমি শুনেছি। তবে দোতারাটা তুমি খুব সুন্দর বাজাচ্ছে।

তুমি কে ?

খিল্‌ খিল্‌ হাসির শব্দ যেন নদীর স্রোতে ছিটকে পড়ল।

চিনতে পারলে না? আমি রাধা। হঠাৎ চোখ নামাল মেয়েটি, তুমি আগে কিষ্ণ সাজতে না?

প্রশান্ত হতভম্ব!

আমি সব জানি। চোখ তুলল মেয়েটি। মুখ ভার করে বলল, তোমার কিছু মনে থাকে না। এটা আমার বাবার দোতারা। তুমি এটা কিনেছ। আমি তোমাকে ভালবাসি কিষ্ণ।

সেই নির্জন নদীর ধারে মেয়েটি হঠাৎ প্রশান্তর কোলে উপুড় হয়ে পড়ে তার কোমর দুহাতে জাপ্টে ধরল।

বুঝতে পারছেন আমার অবস্থা? অনুভব করতে পারছেন দত্তবাবু?

আঁঅ্‌, হ্যাঁ, বলে যাও... শুনছি।

এক নাগাড়ে বৃষ্টি ঝরছে। পথের জলস্রোতের উপর আলো কাঁপছে। ব্যাঙ আর ঝিঁঝির আবহ শব্দে দূরের লাইনে ট্রেনের চাকার আওয়াজ মিশে রয়েছে।

সেই রাধা এখন আমার বউ।

আঁঅ্‌।

হ্যাঁ। শুনে যান।

গড়ে উঠল অগাধ প্রেম। নদীর ধারে, খোলা আকাশের নীচে দুটি হৃদয়ের অপরূপ বৃন্দাবন। সব কিছু জেনে গু প্রশান্তকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে রাধার সঙ্গে একদিন মালা - চন্দন ঘটিয়ে দিলেন। রাথা তার ধর্মপথের আর সঙ্গীতে জগতের সাধন- সঙ্গিনী হল।

বিবরণ শেষে প্রশান্ত হঠাৎ গেয়ে উঠল, গু দিলেন সাধন সঙ্গী, এমনি আমি অর্বাচীন, ক্ষিদের জ্বালায় পদ্মকে ফুলকপি ভেবে মারছি কামড় রাত্রদিন.... থেমে গিয়ে বলল, আমারই অপরাধে তিনটি সন্তান জন্মাল। গবাগলী ছেড়ে দিয়েছি কবে। কখনও গর সঙ্গে কখনও অন্যদের আসরে গান গাই, দোতারা বাজাই। এই করে সংসার চলে। তাতে ধন, অভাব না। আর অভাবী সংসারে যা হয়--- জানেনই তো সব। এরপর প্রশান্ত একটু বেশিক্ষণ চুপথাকল। আবহ শব্দে ট্রেনের আওয়াজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমার কাছে খানিকটা গাঁজা আছে। বানাবো?

কিসে খাবে ?

কল্কে নেই। বিড়িতে ভরি।

তাকিয়ে থাকলাম কোনও এক ছায়া-নৃত্যের মত তার হাত দুটির দিকে। দুটি বিড়ির ভেতর মশলা ঢোকান হল। একটি এগিয়ে দিল আমার দিকে। এই বৃষ্টিঝরা ভিজে হাওয়ার রাতে আমরা একান্ত মনে বেশ খানিকটা ধাঁয়া ফুসফুসে ভরে

ছেড়ে দিলাম জলকণাদের সামনে। শেষটানে এসে মাথার ভেতরের অনাহুত কিছু স্নায়ু যেন জেগে উঠল। ঘিরে ধরল অদ্ভুত এক নিবিড় ঘনত্ব যাতে সব শব্দ আর পরিবেশ ডুবে গেল। শুধু থাকলাম আমরা দুজন। পরস্পরের কাছে ছায়ামূর্তি।

কিন্তু ওই জীবনের কথা আমি ভাবতে চাই না। মনে এলে দুরে সরিয়ে দিই। শুধু, আজ আপনি শুনতে চাইলেন, তাই---

বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে?

না না। কষ্ট আর কি ! বলছি তো, বলেই যাচ্ছি।

ইচ্ছে না করলে---

একবার একটা দলের সঙ্গে আমি সুইডেনে গান গাইতে গিয়েছিলাম।

তুমি বিদেশ গিয়েছিলে।

কিন্তু আমার উচ্চকিত বিস্ময়কে ডুবিয়ে দিয়ে ট্রেনটা মাঝে মাঝে তীব্র শব্দের বাঁশি বাজিয়ে লাইনে চাকারজোর শব্দ দুলে চলে যেতে লাগল। চারপাশ এই শব্দে ভরে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর সে শব্দ সরে গেলেও আমাদের কথকতা আরম্ভ হল না। আমরা আরও কিছু সময় চুপ থাকলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যাঙ আর ঝিঁঝির সঙ্গে শু করা একটা পোকার কাঠ কেটে যাবার শব্দের মিশেল ঘটল। একসময় প্রশান্ত নিচু সুরে গান শু করল, যে দেশে নাই জন্ম মৃত্যু , আমার মন টেনেছে সেই দেশে, গু গো... আমায় নিয়ে চল--- কিন্তু সে গান থামিয়ে কথায় এলো, ফ্রান্স আর সুইডেনে কয়েকটা স্টেজে গান গেয়ে আমার খুব নাম হল। সাহেব মেমরা আমাকে অনেক উপহার দিল। আমাদের দেশের পাঁচ হাজার টাকা দামের একটা চেক ওরা আমাকে ছিল। বুঝলেন, খুব আনন্দ। কিন্তু দেখাবার মত মানুষ আমার ছিল না দত্তবাবা।

কেন? রাধা? তোমার সাধন-সঙ্গিনী!

একরকম ভেবেছিলাম দত্তবাবু। কিন্তু সাধন - সঙ্গিনী হয়েগেল আমার বউ। আর বউ হচ্ছে কেবল তার ছেলেপিলের মা! একসময় সে তার পুষের আর কেউ নয়। বরং পুষটির উপর তার আক্রোশ, রাগ। আমার বিশে যাত্রার সময়. রাধা মুখ গোমড়া করেছিল। একটা কথাও বলেনি। তো, বুঝলেন, উপহার আর টাকা পেয়ে আমি ওসবআর মনে রাখিনি। ভেবেছিলাম ওর মুখে হাসি ফুটবে। আমার আদর নেবার জন্যে বুকে মাথা রাখবে। কিন্তু কি হলজানেন, ঘরে পা দিতেই সে চিৎকার করে বলল, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। এখানে আমাদের ফেলে বিদেশে ফূর্তি করতে তোমার লজ্জা করে না! ওকে আমি বোঝাতে চাইলাম। ওর সামনে বের করে ধরলাম সেই চেকের কাগজটা! কিন্তু ও কি করল জানেন, আমার হাত থেকে ওটা কেড়ে নিয়ে যত অকথ্য কুকথা ভাষা শুনিয়ে যেতে লাগল। আমাকে লম্পট চুয়াড় বলে গালাগালি আরম্ভ করল। তারপর চেকের কাগজটা কুটিকুটিকরে ছিঁড়ে ফেলে আরও একটা সাংঘাতিক কাজ করল।

আমার দ্ধাস স্বর বেল কি ?

ও হঠাৎ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর কাঁধ থেকে দোতারাটা কেড়ে নিল। ওটার গায়ে ছিল ভেলভেটের একটা ঢাকনা। উপহার দিয়েছিল এলিয়ে। সে আমাকে একটা চুমু খেয়েছিল। আপনি হাসলেন?

না। দেখতে পাচ্ছি।

তাহলে আরও দেখুন---

আমি প্রশান্তর কথন অনুসরণ করে দেখলাম, বাঁধা দোতারার গা থেকে সেই ঢাকনা যেন চামড়া ছাড়ানোরমত টেনে খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। চিৎকার করে বলল, আমার বাবার দোতারা। এটা আমি কোনও নোংরা কাজে, কোনও চরিত্রহীনের হাতে থাকতে দেব না। তারপর সে যন্ত্রটির ময়ুরপাখনার মাথার দিকটা দুহাতে ধরে মাথার উপর তুলল। আর তুলেই চোখের পলকে আছড়ে ফেলল মাটিতে। কোনও মাথার খুলি ফাটার একটা আওয়াজের সঙ্গে সুরে বাঁধা চারটি তারের ছিঁড়ে যাবার শব্দ মিশে গেল!

তারপর বুঝতে পারছেন, আমার আর কি করার থাকে। বউকে ধরে বেদম পেটালাম। মদ খেলাম। আরও মদ খেলাম। সব ছেড়ে হলাম ট্রাক ড্রাইভার। এই একটা বীজন---

পথে নেমে দেখি জলের সূক্ষ্ম কণারা ঝরছে। আমাদের পাড়া অনেকটা দূরে। মাথা ভিজে যাবে, জামা প্যান্টের অনেকটাই

শুকনো থাকবে না। কিন্তু আমরা কেয়ার করলাম না।
যেতে যেতে প্রশান্ত বলল, অতীত এমন একটা বস্তু দত্তবাবু, সে আপনারই, আপনার সামনে সে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু আপনি তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে পারবেন না। ছুঁতে পারবেন না!
পাশাপাশি চুপচাপ চলা হতে লাগল।



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com